Stories from the Quarter

২০ এপ্রিল ২০২২

আমার নাম ওয়ালী উল্লাহ, উল্লাহ পদবী, ডাকনাম রুবেল, চাচা আদর করে ডাকতেন এই নামে। জন্মেছি ১৯৭৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। রাজধানীর পুরান ঢাকায় কলেজ জীবন পর্যন্ত কাটিয়ে চেন্নাই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে ভারত গিয়েছিলাম, চার বছর ছিলাম, পরে যুক্তরাজ্যে এলাম। কলেজ জীবনের পুরোটাই বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, লেখাপড়া তেমন করতাম না। পুরান ঢাকা থেকে চেন্নাইয়ের স্বাধীন জীবনের দিকে উড়াল দিলাম, বহু জাতের ছাত্র সেখানে পড়তে আসে। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, ভারী সুন্দর সময় কাটিয়েছি। ইয়েমেনি এক ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, মনে হলো যেন বাঙালি বন্ধুই। এখনো আমরা যে পাঁচজন চেন্নাইয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট ছিলাম, তাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের স্মৃতি বলতে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বেড়াবার স্মৃতি। মা এখনো বাংলাদেশে, আমার বাবা বহুকাল হয় মারা গেছেন। সাত ভাইবোনের বিশাল পরিবার। ছেলেদের ভেতর আমি সবার বড়, আমার বড় দুই বোন আছেন, বাকিরা আমার ছোট। মায়ের হাতের রান্না মিস করি। আমাদের এলাকায় মায়ের রান্নার সুনাম ছিল, চুটকি সেমাই বানাতেন খুব চমৎকার করে। সত্যি বলতে কি, আমি কখনো ফুড বা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চাইনি। বিজনেস ডিগ্রি নেবার পর আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে জড়িয়েছি, কেটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করি। কাজটা করতে গিয়ে আমার ব্যবসায়ের অংশীদারের সঙ্গে পরিচিত হই, এরপর কেটারিং- ইন্ডাস্ট্রিতেই পাকাপাকি জড়িয়ে পড়ি। ভোজনবিলাসী তো আমি বটেই, রান্না করতেও ভালোবাসি। পুরান ঢাকা থেকে এসেছি, আসল মোগলাই খানার এলাকা সেটা, মানুষ সেখানে সকাল-সন্ধ্যা বিরিয়ানির ওপরেই থাকে, তাই সেই টানটা উপেক্ষা করতে পারি না। ভাবলাম, আচ্ছা দেখিই না এই বিজনেস করে! সেভাবেই শুরু।

ঢাকা শহরের দুইটি ভাগ, পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকা। পুরান ঢাকা মোগল আমলের শহর, নওয়াবরা সেখানে শাসন করতেন। আমি পুরান ঢাকার পঞ্চায়েত পরিবার থেকে এসেছি। নওয়াবদের পরে ঢাকা বাইশ পঞ্চায়েত দ্বারা শাসিত হতো। সেই বাইশজনের একজন আমার দাদা। ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে তাঁর নাম-ধাম লেখা রয়েছে, যদিও ছবি নেই। পুরান ঢাকা স্বভাবতই খাবারদাবারের জন্য বিখ্যাত, আর বিখ্যাত ঢাকাই ভাষা এবং উচ্চারণের জন্য। মানুষ যথেষ্ট উপকারী, পয়সাওয়ালাদের এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল ব্যাংক রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বাড়িঘর, নওয়াবদের বিখ্যাত আহসান মঞ্জিল তো আছেই।

আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ঢাকায় একটা ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানির সঙ্গে কাজ শুরু করি। ২০০০ সালে আমি বিয়ে করি, উপলব্ধি করি যে হায়ার স্টাডিজের জন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে। পারিবারিকভাবে আমরা রাজনৈতিক পরিবার, অনেকরকম অনিশ্চয়তা। মা এবং চাচারা

আমাকে ঠেলতে লাগলেন দেশের বাইরে স্থায়ী হবার জন্য। ২০০৩ সালে একটা ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ে এখানে আসি, দেড় বছর কোর্স করে ফিরে যাই, এরপর ২০০৫এ হাইলি স্কিলড মাইগ্রেশন স্কিমের আওতায় ভাগ্যক্রমে আবার আসি যুক্তরাজ্যে। প্রাথমিকভাবে আমি লন্ডনে থাকতাম, লন্ডনকে পুরান ঢাকার মতো লাগতো—ভিড়ভাট্টায় দম আটকে আসতো। ভাবতাম, অন্য কোথাও যাই না কেন যেখানে আরেকটু ছিমছাম পরিপাটি জীবন, মানুষ যেখানে ভালো। এক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দেয় নরউইচে চলে আসতে। একদিনের জন্য নরউইচ ঘুরে দেখতে আসি, সবুজে আচ্ছন্ন শহর আর শহরের মানুষ দুইই খুব ভালো লেগে যায়। আবহাওয়া ভালো, পুরান ঢাকার মতোই ঐতিহাসিক স্থাপনায় বোঝাই এলাকা—যা আমি খুব ভালোবাসি। বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিই, ২০০৬ এ নরউইচ চলে আসি, সেদিন লর্ড মেয়র ফেস্টিভ্যালের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ, ব্যারিকেড দেয়া, ছেলেকে কোলে নিয়ে দেখছিলাম মেয়রের প্যারেড। খুব ভালো লেগেছিল। মেয়র এখনো আমার রেস্টুরেন্টের কাস্টমার। আমাদের রেস্টুরেন্টটা লিস্টেড বিল্ডিং, এমনকি এর সিলিং-ও লিস্টেড। এটা জানবার পরে আমরা এই বাড়িটি নিই, ২০ বছর এটি অন্ধকারে ছিল, আমরা কিছু বদলাইনি, শুধু দারুণ ইন্ডিয়ান খাবার পাওয়া যায় এখন।

তখনকার তুলনায় মানুষ বেড়েছে নরউইচে, যানবাহনের আনাগোনা বেড়েছে, বেড়েছে অভিবাসী সংখ্যা। যখন এসেছিলাম, তখন বাঙালি কমিউনিটির ৪৫-৫০টা পরিবার ছিল। নরফোক এবং নরউইচ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের হয়ে আমি ভলান্টারি কাজ করতাম। এখন ৫০ এর জায়গায় ১৫০ পরিবার এসেছে, ডাক্তার-সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এসেছেন। আগে ওয়াটারলু পার্ক এবং তার আশপাশের খেলার মাঠে বাচ্চাদের নিয়ে যেতাম, এখন তেমন খোলা জায়গা অন্যত্র আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের বাড়ির আশপাশের এলাকায় নেই। থাকা উচিত।

দীর্ঘদিন প্রেম করার পর ২৪ বছর বয়সে আমি বিয়ে করি। ওদের পরিবার প্রথমে এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি, ঢাকাইয়ারাও নিজেদের ভিতর সম্পর্ক করে। ওর নানা আমাকে ডেকে পাঠান, বিয়ের প্রস্তাব দেই, তাঁর বাড়িতেই আমাদের বিয়ে হয়। আমার প্রথম সন্তানের বয়স ১৮, এ লেভেল দেবে, ছোটটির বয়স ৮, স্পেশাল নিডজ চাইল্ড। আমাদের তৃতীয় সন্তান জন্ম নেবে আগামী সপ্তাহে। এইই আমার পরিবার। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ছিল আমার ছোট ছেলের জন্মমুহূর্ত। ওর ৩ বছর বয়সে ডাক্তাররা আমাদের জানায় ওর অটিজম রয়েছে, এখনো ঠিক করে কথা বলতে পারে না, তবু সে আমার ভীষণ প্রিয়।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার চাচার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা ছিল। ২০০৪ সালের আগ পর্যন্ত ৮ বছর ধরে তিনি এলাকার কাউন্সিলর ছিলেন। আমাদের বাড়িটা ছিল বড়, ৩০-৩৫জন সদস্য একত্রে থাকতাম, এবাড়ি থেকেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। দিনে ৫০ জনের রান্না হতো সেখানে। পড়ালেখা তো করতাম না, কলেজে থাকতেই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ২০০৫ এ বিরোধী দলের খুনীরা আমার চাচাকে খুন করে। বিএনপি-জামাতের খুনোখুনি থেকে বাঁচতে আমি এখানে আসি।

জীবনের শিক্ষা যদি বলেন—হতাশ হতে আমি শিখিনি। যেটুকু আমার পেশা, আমি নিজহাতে দাঁড় করিয়েছি। এগিয়ে যাওয়ার একটা তাড়না সবসময়ই ছিল, তাই হার মানিনি। আমার একটা লক্ষ্য রয়েছে এবং সেটা আমি করে ছাড়ি। বাংলাদেশের গরীবদের জন্য আমি কিছু করতে চাই। আমার পরিবারের দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঢাকায়। ভালো ছাত্রদের আমরা সহায়তা দিতে চাই। আমার ছেলে ডাক্তারি পড়বে, সে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে মানুষের সেবা করতে চায়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমি নরউইচ আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দাওয়াত পাই, তখন আমাদের স্থানীয় এমপি ক্লাইভ লুইস অনেক সহায়তা করেছেন। আমার ব্যবসায়েও একবার ঝামেলা হলো কাউন্সিলের সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ তিনি সাহায্য করেছিলেন।